অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান :

শব্দপ্রমাণ বা বেদবাক্যের নিত্যতা সিদ্ধ করতে গিয়ে শব্দ, বর্ণ, পদ ও শব্দার্থ বিচারের পর মীমাংসকদেরকে বাক্যার্থের বিচারে উপনীত হতে হয়। ভাট্ট-মীমাংসামতে শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক শব্দ বা পদ পরস্পর বাক্যার্থজ্ঞানে অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে তাই বাক্যার্থ। শব্দার্থকে বলা হয় অভিধান। কোন শব্দের দ্বারা যে বস্তু বা ধারণাকে বোঝায় তা হলো ঐ শব্দের অভিধেয়। পদের এই অভিধার প্রকাশ এবং অন্বয় সম্পর্কে ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শব্দের অর্থ কীভাবে প্রকাশিত হয় ? ভাট্টসম্মত শাব্দজ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে নারায়ণ ভট্ট বলেছেন-

‘তত্র তাবৎ পদৈর্জ্ঞাতৈঃ পদার্থস্মরণে কৃতে।
অসন্নিকৃষ্টবাক্যার্থজ্ঞানং শাব্দমিতীর্যতে।’- (মানমেয়োদয়)
অর্থাৎ : প্রথমে পদগুলি জ্ঞানের বিষয় হয়। সেই পদগুলি জ্ঞাত হলে পদের অর্থের স্মরণ হয়। পদার্থের স্মরণের পর অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থের যে জ্ঞান হয়, তাকেই শাব্দপ্রমা বলে।

শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক পদ পরস্পর বাক্যার্থজ্ঞানে অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, তাই বাক্যার্থ। যে বাক্যের অর্থ পূর্বে জানা ছিলো না বা যে বাক্যার্থের বাধজ্ঞান থাকে না, সেরূপ বাক্যার্থকে অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ বলে, ঐরূপ বাক্যার্থজ্ঞানই শাব্দপ্রমা। যে বাক্যার্থ পূর্বে জ্ঞাত হয়েছিলো (সন্নিকৃষ্টার্থ) সেরূপ বাক্যার্থজ্ঞান অনুবাদস্বরূপ হওয়ায় তা আর প্রমা হয় না। আর যে বাক্যার্থের জ্ঞান বাধিত হয়, সেই বাক্যার্থজ্ঞান ভ্রমাত্মক হয় বলে তা প্রমা হয় না। এজন্য অসন্নিকৃষ্টার্থ বাক্যার্থজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

ভাট্টমতে শব্দার্থের জ্ঞান না হলে বাক্যার্থজ্ঞান হতে পারে না। বাক্য হচ্ছে- পদসমষ্টি। পদসমূহের অর্থজ্ঞান বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু, শুধু পদ বা বাক্য বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু নয়। আবার বাক্য না শুনেও অনেক সময় বাক্যার্থের জ্ঞান হতে পারে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কুমারিল বলেন-

‘পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ।
খুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতোহশ্বো ধাবতীতি ধীঃ।
দৃষ্টা বাক্যবিনির্ম্মুক্তা ন পদার্থৈর্বিনা ক্বচিৎ।।’- (শ্লোকবার্ত্তিক)
অর্থাৎ : এক ব্যক্তি দূর থেকে সাদা রং-এর কোনও প্রাণী দেখে প্রাণীটিকে চিনতে পারলো না। তার শুধু শ্বেতগুণরূপ পদার্থের জ্ঞান হল। এরপর সেইদিকেই হ্রেষাশব্দ শুনতে পেয়ে শ্বেতবর্ণ প্রাণীটিকে ঘোড়া বলে অনুমান করলো। পরে খুরনিক্ষেপের শব্দ শুনতে পেয়ে লোকটি বুঝলো- (ঘোড়াটি) দৌড়াচ্ছে। তখন লোকটি

তিনটি পদার্থের সম্বন্ধকে অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করে বুঝলো যে, সাদা ঘোড়াটি দৌড়াচ্ছে। এই জ্ঞানের মূলে কোন বাক্য না থাকলেও তা বাক্যার্থজ্ঞান।

অতএব, তাঁর মতে- বাক্য বা পদ বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু নয়, বরং পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থবোধের হেতু। পদসমূহ আপন আপন অর্থ বুঝিয়ে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অন্য কিছু বুঝাতে তাদের সামর্থ্য থাকে না। তাই বলা হয়-

'শব্দবুদ্ধিকর্ম্মাণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ।'

অর্থাৎ : শব্দ, বুদ্ধি এবং ক্রিয়া তাদের ব্যাপার অর্থাৎ কার্য একবার নিবৃত্ত হলে আর ব্যাপার হয় না।

আর তাই নিজের অর্থ বুঝিয়ে শব্দের অভিধার কার্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এজন্য তা আর বাক্যার্থের বোধক হতে পারে না। এ কারণেই পদ বা বাক্য বাক্যার্থের বাচক হতে পারে না। মীমাংসক কুমারিলের মতে- কি লৌকিক কি বৈদিক সকল পদই অন্য পদের অপেক্ষা না রেখেই একটি অর্থ প্রকাশ করে। সে অর্থ অভিধাবৃত্তি থেকে লাভ করা যায়, আর অভিধা থেকে পদের যে অর্থজ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই অভিধান। এভাবে একাধিক পদ শুনলে প্রথমতঃ প্রত্যেক পদের অর্থের জ্ঞান হয়। পরে পদার্থগুলি (বিভিন্ন পদের অর্থগুলি) বিশেষ্য-বিশেষণভাবে পরস্পরের সাথে অন্বয় সম্বন্ধ হয়। পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থগুলি পরে জ্ঞানের বিষয় হয়ে বাক্যার্থ জ্ঞান জন্মায়। বাক্যের প্রত্যেক পদের অর্থের সাথে অপর পদের অর্থের যে পারস্পরিক অন্বয় হয়, তার নামই অভিহিতান্বয়। পরস্পরের এই অন্বয় সম্ভব হয় বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের দ্বারা। কুমারিলের এই মতবাদ অভিহিতান্বয়বাদ নামে পরিচিত।

মোটকথা, কুমারিলের অভিহিতান্বয়বাদ হলো- প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ পূর্বে নির্ধারণ করে পরে স্বতন্ত্র অর্থযুক্ত শব্দগুলি সাজিয়ে বাক্য রচনা করা হয়। স্বয়ং ভাষ্যকার শবরস্বামীর ঝোঁকও মনে হয় অভিহিতান্বয়বাদেরই পক্ষে। কেননা তিনি তাঁর শাবরভাষ্যে এ বিষয়ে বলেছেন-

'নানপেক্ষ্যপদার্থন্ পার্থগর্থ্যনে বাক্যমর্থান্তর-প্রসিদ্ধম্ ।... পদানি হি স্বং স্বং পদার্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থং গময়ন্তি।'- (শাবরভাষ্য-মীমাংসাসূত্র-১/১/২৫)।

অর্থাৎ : স্বতন্ত্র অর্থযুক্ত পদগুলির পাস্পরিক অন্বয়েই বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মায়, যার সাথে লৌকিক ও বৈদিক পদ এবং পদার্থের মধ্যে কোন ভেদ নেই।... শব্দের দ্বারা বাক্যরচনার পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে 'অভিহিত' বা বোধিত অর্থগুলি 'অন্বিত' বা পরস্পরসম্বন্ধ হয়ে বাক্যার্থ সংঘটিত হয়। (মুক্ততর্জমা)

প্রভাকর ও অন্বিতাভিধানবাদ

অন্যদিকে মীমাংসক প্রভাকর অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন করেন নি। তিনি অন্বিতাভিধানবাদী। তাঁর মতে, শব্দগুলি কোন-না-কোন বাক্যের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত বা সম্বন্ধ হয়েই নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, অসম্বন্ধ বা অনন্বিত অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ, পদার্থের জ্ঞানের জন্য পদকে পদের ক্রিয়ার সঙ্গে আগে অন্বিত হতে হয়। অন্বিত শব্দেরই শক্তিগ্রহ হয়। প্রথমে পদসমূহের দ্বারা পদার্থসমূহের পৃথক পৃথক অন্বয় হয়। এভাবে পদার্থের (পদের অর্থের) জ্ঞান হয়। পদার্থের জ্ঞান তাই অন্বয়সাপেক্ষ।

গুরু প্রভাকর স্বীকৃত অন্বিতাভিধানবাদ মতে, ক্রিয়ার সাথে অন্বিত না হলে কোন পদেরই অর্থজ্ঞান হয় না। অন্বয়শক্তিও পদসমূহে অবস্থিত। ক্রিয়ার সাথে অন্বিত পদেরই অর্থজ্ঞান হয় বলে এই মতের নাম অন্বিতাভিধান। এই মতে একাধিক পদের দ্বারা পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একাধিক পদার্থের জ্ঞান হতে পারে না। বিভক্ত্যন্ত একটি পদের অর্থের সাথে অন্বিত অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণরূপ সম্বন্ধে অন্য একটি পদার্থই অনুভবের বিষয়ীভূত হয়। দুটি পদের দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে দুটি পদার্থের অনুভব হয় না। পরস্পর অন্বিতের অভিধানকেই অন্বিতাভিধান বলা হয়েছে। প্রভাকর অন্বিতাভিধানকে বলেছেন- 'ব্যতিষক্তার্থাভিধান'। ব্যতিষক্ত হলো- ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্বন্ধ শব্দার্থ। যাঁরা অন্বিতাভিধানের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, প্রভাকর তাদের বিদ্রূপ করে বলেছেন-

'পদপদার্থনভিজ্ঞো মাতৃপ্রিয়ো ভবান্ ।'- (বৃহতী-মীমাংসাসূত্র-১/১/২৫)
অর্থাৎ : মাতৃস্নেহের অতিরিক্ত আকর্ষণে আপনি বেশিদিন গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাভ্যাস করতে পারেন নি, তাই পদ ও পদার্থের তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রয়ে গেছেন।

প্রাভাকর-মতাবলম্বীরা তাঁদের এই অন্বিতাভিধান সিদ্ধান্তের সমর্থনে শব্দার্থবিষয়ে অজ্ঞ শিশুর প্রাথমিক শব্দার্থবোধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন (সূত্র: সুখময় ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, পৃষ্ঠা-৩২)-

'শব্দবৃদ্ধাভিধেয়াংশ্চ প্রত্যক্ষেণাত্র পশ্যতি।
শ্রোতুশ্চ প্রতিপন্নত্বমনুমানেন চেষ্টয়া।।
অন্যথানুপপত্ত্যা তু বোধেচ্ছক্তিদ্বয়াত্মিকাম্ ।
অর্থাপত্ত্যাবুধ্যেত সম্বন্ধং ত্রিপ্রমাণকম্ ।।'

অর্থাৎ : কোন ব্যক্তি তাঁর ভৃত্যকে আদেশ করলেন- 'গরুটি আন'। এখানে শব্দার্থ বিষয়ে যার জ্ঞান নেই, সেই নিকটস্থ শিশু বাক্যটি শুনলো এবং আদেষ্টা ও আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেখলো। সে গরুর আনয়নরূপ কর্মটিও প্রত্যক্ষ করলো। এই বাক্যটি শুনেই যে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেষ্টার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছে, তাও শিশুটি আদিষ্ট

কর্তৃক গরুটি আনয়নরূপ শারীরিক চেষ্টা দেখে অনুমান করলো। আদেষ্টার বাক্যের সাথে গরুর আনয়নরূপ কর্মের যে বাচ্যবাচকত্ব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও শিশুটি অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা বুঝতে পারলো। (যেহেতু এই বাক্যের বাচকতা না থাকলে আদিষ্ট কর্তৃক গরুটি আনয়নরূপ অর্থের জ্ঞান হতো না।) পরে এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অর্থাপত্তি প্রমাণের বলে এবং গরুশব্দসত্ত্বে এই প্রাণীর সত্তা এবং আনয়নশব্দসত্ত্বে সমীপীকরণের সত্তা প্রভৃতি অন্বয়ব্যতিরেকবলে শব্দগুলির সঙ্কেত বা শক্তি শিশুটি জানতে পারলো।

এতে বোঝা যাচ্ছে, অন্বিত পদার্থের দ্বারাই প্রাথমিক শব্দার্থজ্ঞান হয়ে থাকে। একটি পদের অর্থমাত্রের দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থ সর্বদাই অপর পদার্থে অন্বিত। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভাট্ট-মীমাংসকরা, এবং সাধারণভাবে আমাদেরও মনে হয় যে, শিশুকাল থেকে আমরা এক একটি বিচ্ছিন্ন শব্দের 'বিশুদ্ধ' বিচ্ছিন্ন অর্থ শিখি (যেমন একে গাছ বলে, একে ফুল বলে ইত্যাদি), তারপর এগুলি মিশিয়ে বাক্যরচনা শিখি। দু-চারটি শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ এভাবে শিশু শেখে বটে। কিন্তু শিশুকাল থেকে আমরা যে শত শত শব্দের শত শত অর্থ শিখি তার কটা এভাবে শেখানো সম্ভব ? অথচ আমাদের অজান্তে শিশু যে কয়েক ডজন শব্দ কখোন ব্যবহার করতে শিখলো, তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে যাই। অথচ শিশু কিন্তু এসব শিখে পরিবার-পরিজনের কথাবার্তা শুনে, বিশেষত বড়োদের বাক্যাকারে কথাবার্তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো কাজের যোগাযোগ লক্ষ্য করে। প্রভাকরপন্থী মীমাংসকরা এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন লোকায়ত কৃষিসমাজের উপযোগী কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের দ্যোতক কার্যকলাপ থেকে।-
'ধরুন বাবা বড়ো ছেলেকে বলল- 'গাম্ আনয়' (গরুটাকে নিয়ে এস)। পাশের ছোটো খোকা দেখল বাক্যটি বলার সঙ্গে সঙ্গে দাদা একটা শিংওয়ালা চারপেয়ে প্রাণী নিয়ে এল। শিশু সম্পূর্ণ বাক্যটির একটা সম্পূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক আন্দাজ করল। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পৃথক অর্থ এখনও সে বোঝেনি, অর্থাৎ 'গাম্' মানে 'গরুটাকে' এবং 'আনয়' মানে 'নিয়ে এস' এরকম ধারণা তার এখনও হল না। এখন ধরুন বাবা বলল- 'গাম্ বধান' (গরুটাকে বেঁধে রাখ), 'অশ্বম্ আনয়' (ঘোড়াটাকে নিয়ে এস)। বড়ো ছেলে বাবার আদেশ পালন করল। কয়েকবার এরকম কথা ও কাজের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশু লক্ষ করল বাক্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাজের পরিবর্তন ঘটছে, আরও লক্ষ করল, প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে 'গাম্' শব্দটি একই থাকছে, কিন্তু 'আনয়'-এর স্থানে 'বধান' এসে যাচ্ছে, একই বস্তুর (প্রাণীর) সম্বন্ধে দুরকম কাজ হচ্ছে। আবার তৃতীয় বাক্যটিতে 'গাম্'-এর স্থানে 'অশ্বম্' এসে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বাক্যের 'বধান' চলে যাচ্ছে, তার জায়গায় প্রথম বাক্যের 'আনয়' আবার ফিরে আসছে, তৃতীয় কাজটা প্রথম কাজের অনুরূপ হচ্ছে। এভাবে বাক্যের অন্তর্গত শব্দের যোগবিয়োগ (আবাপ-উদ্বাপ) এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিবর্তন বার বার লক্ষ করে পাশের শিশুটি 'গাম্, অশ্বম্, আনয়, বধান' প্রভৃতি পদের পৃথক অর্থ বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লিষ্ট করে একরকম আন্দাজ করে নিল, পরে নিজেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করতে শিখল- 'দাদা, গোরুটাকে নিয়ে এস, গোরুটাকে বেঁধে রাখ, ঘোড়াটাকে নিয়ে এস।' বলা বাহুল্য, শিশুর এই বিশ্লেষণী বুদ্ধি ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে হয়নি। শিশুর এটা 'স্বভাব ন্যায়' বা instructive logic। কিন্তু শাস্ত্রকাররা শিশুর এ জাতীয় বুদ্ধিবিকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন ভাষা প্রয়োগ করেন যাতে মনে হতে পারে শিশুও বোধ হয় বড়োদের মতো 'অনুমান'

করছে, যেন সচেতনভাবে ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োগ করছে।'- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, পৃষ্ঠা-১৩০)।

এখানে আরেকটা বিষয়ও লক্ষ্য করতে হয়, শিশু যখন এরূপ 'বৃদ্ধব্যবহার' শোনে বা দেখে, তখন কিন্তু বাক্যবিযুক্ত বা শব্দান্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি 'বিশুদ্ধ' 'গো'-শব্দ এবং তার অর্থরূপে অন্য বস্তু বা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটি বিশুদ্ধ 'গরু', যে গরু শোয় না, বসে না, হাঁটে না, দৌড়ায় না, খায় না, যে গরু কেবল নিছক গরু মাত্র, এমন একটি নিঃসঙ্গ গোশব্দ এবং নিঃসঙ্গ গো-পদার্থ শিশু কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না। বরং শিশুর মনে স্বাভাবিকভাবে এ ধারণাই জন্মে যে কোনো শব্দ অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে এবং শব্দার্থও অন্য কোনো শব্দার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়- এক কথায়, পরস্পরসম্বন্ধ শব্দ পরস্পরসম্বন্ধ অর্থ প্রকাশ করে। জগতের বস্তুসমূহ পরস্পর-সম্বন্ধ বলেই মানুষের ভাষাতেও শব্দগুলি পরস্পরসম্বন্ধভাবে বাক্যাকারে উচ্চারিত হয়। এখনকার শিশুরাও এভাবেই শেখে। পরিবার পরিজনের মধ্যে শিশু অনবরত কথার সঙ্গে কজের সম্বন্ধ লক্ষ্য করে, শব্দ-পরিবর্তনের আনুষঙ্গিকরূপে কার্যপরিবর্তন লক্ষ্য করে। এভাবে কার্যান্বিতরূপে শব্দার্থের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

এই লোকব্যবহারের সাথে অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর-মতের সংগতি পরিলক্ষিত হয়। লোকব্যবহারে কোন শব্দার্থ যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় না, অন্য কোন শব্দার্থের সঙ্গে অন্বিত রূপেই প্রতিভাসিত হয়, সেহেতু পরস্পরসম্বন্ধ শব্দার্থসমূহই বাক্য, তৎ-অতিরিক্ত বাক্য বলে কিছু নেই। এ পর্যায়ে এসে যে অনিবার্য প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হলো, ভাষার ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মগুলি তাহলে কোন প্রক্রিয়া মেনে চলে ? ব্যাকরণের নিয়মে অর্থবহ শব্দ বলতে কী বোঝায় তার বিচারও আবশ্যক মনে হয়।